পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ জুন ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

সন্তানের অনলাইন গতিবিধি লক্ষ রাখুন

বর্তমান যুগ বলতে গেলে ইন্টারনেটের হাতে বন্দি। বড়দের হাতে তো বটেই ছোটরাও আকৃষ্ট নেটের জাদুতে। ফলে আমরা এখন নেট নির্ভর। অনেক সময়ে বড়রা যখন কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের নিজেদের সুবিধার্থে বাচ্চাদের হাতে মোবাইল থেকে কম্পিউটার তুলে দিচ্ছে। তারাও অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে ইচ্ছে খুশি মতো ব্যবহার করছে। সমস্যা হল বেশিরভাগ বাচ্চাদের এই ব্যবহারের ওপর অভিভাবকেরা তাদের সঠিক দৃষ্টিপাত করতে পারছে না, সেটি যে কোনও কারণেই হোক। ফলে শিশুরা না বুঝেই অনেক কিছু জিনিসের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। যা শিশুমনে ক্ষতি ডেকে আনছে।

তবে বর্তমানে বাচ্চাদের এই সমস্ত কিছু অভ্যাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখা খুবই কঠিন। তবে অভিভাবকদের উচিত সদা সতর্ক থাকা। কারণ ইন্টারনেটে সবকিছুই খুব সহজলভ্য। ফলে তার জন্য উপযুক্ত নয় এমন কোনও সাইটও একটি শিশু খুব সহজেই হাতের কাছে পেয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিক ভাবে এরজন্য সমস্যা বাড়বে বই কমবে না।

অনেক সময় বাচ্চা বাবা-মা'কে না জানিয়ে ইন্টারনেটের ব্যবহার করে থাকে। কারণ তাদের মনে হয়, সে যে জিনিসগুলি দেখছে সেগুলি তাকে দেখতে দেওয়া হবে না। তাই লুকিয়ে চলতে থাকে সমস্ত কার্যকলাপ। যা একটি বাচ্চার ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত অবস্থা ডেকে আনতে পারে। আবার অনেক সময় বাড়িতে কম্পিউটারে ইন্টারনেটের ব্যবহার বন্ধ করে দিলে, সেই বাচ্চাটি সাইবার ক্যাফেতে গিয়েও তার ইচ্ছেমতো কাজ করে। তাই এক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনেক সংবেদশীলতার সঙ্গে সচেতনভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বেশিরভাগ বাবা-মা জানেন না, তাঁদের না জানিয়ে নানা অনৈতিক কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ছে তাঁদের সন্তানরা। অনেক সময়ে বাচ্চারা জড়িয়ে যায় সাইবার বুলিং সহ নানা ধরনের অনৈতিক কাজ-কর্মে। এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে যা অভিভাবকদের মধ্যে কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাবা-মা এই সমস্ত কিছু বুঝলেও তাদের কিছু করার থাকছে না। তবে প্যারেন্ট্যাল কন্ট্রোল সহ বেশ কিছু ভালো মানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তার কারণ সন্তানের অনলাইন গতিবিধি নজরে রাখার পাশাপাশি এতে সাইবার বুলিং সহ যে কোনও অনলাইন প্রতারণা রোধ করা যাবে।

এসব ছাড়াও সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন, এই সব জিনিসের কুফল কী হতে পারে। অযথা বকাঝকা না করে কম্পিউটার আমরা কেন ব্যবহার করে থাকি। সে সম্পর্কে তাকে অবগত করুন। অনলাইনের মাধ্যমে সে কী ধরনের সুবিধে পেতে পারে সেগুলি তাকে বোঝান। কম্পিউটার যে একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, বর্তমানে তার কার্যকারিতা ঠিক কী সেটা তাকে বুঝিয়ে বলুন। সন্তানকে নির্দেশ দিলেও সেটি তাকে বন্ধুর মতো করেই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। যাতে তার এটা না মনে হয় যে তার ওপর অযথা জোর করা হচ্ছে। অনেক সময়ে আপনার বাচ্চাটি যখন কম্পিউটারে বসে তার কাজ করে তখন আপনিও তার পাশে বসে তাকে কিছুটা সময় দিন। তবে যেন পুরো ব্যাপারটিই বন্ধুর মতো থাকে সেটি খেয়াল রাখতে হবে। তবেই সমস্যা অনেকটা আপনার

এরপর তিনের পাতায়

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

পাঠ্যবিষয় খুঁটিয়ে পড়ো

নবনীতা চট্টোপাধ্যায় শিক্ষিকা,
বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস

বর্তমানে যে সমস্যাটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাবাচ্ছে সেটি হল একজন ছাত্রীর পঞ্চম শ্রেণি থেকেই সমস্ত বিষয়ের ওপর টিউশন নেওয়া। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই তাকে ফের টিউশন নিতে ছুটতে হচ্ছে। তাদের কাছ থেকেই আমরা শুনতে পাই যে গৃহশিক্ষিকার হোমওয়ার্ক ছিল তাই স্কুল শিক্ষিকার পড়া তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

তাই আমি বলব, তৈরি নোটস না ফলো করে পাঠ্যবিষয়গুলি ভালোভাবে পড়া উচিত। কারণ একজন স্কুলশিক্ষিকা যেভাবে পাঠ্য বিষয়টি পড়াচ্ছেন তাতে আর কোনও সমস্যা তৈরি হওয়ার কথা নয়।

উঁচু ক্লাসের ক্ষেত্রে বলব, লেখার উপর জোর দেওয়া উচিত। সহায়িকা থেকে তারা তৈরি জিনিস হাতে পেয়ে যাচ্ছে। সহায়িকা সব সময় খারাপ বলব না, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে একটা জিনিস তৈরি করার অভ্যাসটা চলে যাচ্ছে। বর্তমান সিলেবাসেরও রদবদল হয়েছে। তাই আমার পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া উচিত।

সেই সঙ্গে বলব, আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে। অভিভাবকদেরই এই ব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত। তাদের সামনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে সমালোচনা বন্ধ হওয়া দরকার। বাড়ি থেকেই সেই মূল্যবোধ গড়ে তোলা উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে ও শিক্ষার মান বাড়াতে হলে পাসফেল চালু করা দরকার।

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

বাড়িতে পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যাস করি

রিষা মাহাতো পঞ্চম শ্রেণি,
হোলি ফ্যামিলি গার্লস হাই স্কুল

রিষা এখন সবে ক্লাস ফাইভে পড়ে। কিন্তু এখন থেকেই সে তার দায়িত্ব নিয়ে সচেতন। একটা বিষয় সে বুঝে গিয়েছে যে নিজেকে জীবনে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সে যা করে ভালোবেসে করে বলে সবার ভালোবাসা যেমন পায় তেমনি তার চেষ্টার সে সুফল পায়। আর সব বিষয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়তেই সে পছন্দ করে। এতে একঘেয়েমি আসে না। পড়া ভালো মনে থাকে। পড়াশোনা নিয়ে রিষা কীভাবে আজ আমরা তার কাছ থেকেই জানব।

উত্তরণ: তোমার পড়াশোনার কোনও নির্দিষ্ট রুটিন আছে?

রিষা: সারা বছর সকাল-বিকেল নিয়ম করেই পড়তে বসি। তবে পরীক্ষার আগে একটু রাত জেগে পড়া আমার অভ্যেস। পড়া তৈরি থাকলেও বারবার পড়ি।

উত্তরণ: বাড়িতে তোমায় কে সাহায্য করেন?

রিষা: মা বাড়িতে পড়া দেন আর পড়া ধরেন। দিদিও সাহায্য করে।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

রিষা: ইংরাজি আর অঙ্ক।

উত্তরণ: এর জন্যে বিশেষ কোনও প্রস্তুতি?

রিষা: অঙ্ক রোজ করি। দিদির সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলি। রোজ ট্রান্সলেশন করি।

উত্তরণ: অন্যান্য বিষয়?

রিষা: ভালো করে বই পড়ি। রোজকার পড়া তৈরি করি। স্কুলের পড়া আগের থেকে তৈরি করি। বাড়িতে বারে বারে পরীক্ষা দিই। স্কুলের সব পরীক্ষা গুরুত্ব দিয়ে পড়ি।

উত্তরণ: অবসর সময়ে কী করো?

রিষা: গল্পের বই পড়ি আর কার্টুন দেখতে আমার ভালো লাগে।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বই বা কার্টুন কী কী?

রিষা: রূপকথার, পঞ্চতন্ত্রের গল্প পড়তে ভালো লাগে। গোপাল ভাঁড়ের কার্টুন দেখতে ভালো লাগে।

উত্তরণ: তোমার সাফল্য কামনা করি।

প্রত্যেক স্কুলের ফার্স্টবয় ও ফার্স্টগার্ল-রা এই বিভাগে যোগ দিতে পারো।
ফোন: 033 40605837 (১২টা থেকে ৬টা), ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com

দুইয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
আমাদের দেশের সংবিধান রচনা
তিনের পাতায়
কম্পিউটার টিপস
হেল্‌থ টিপস
চারের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ভৌতবিজ্ঞান
জীবন বিজ্ঞান
পাঁচের পাতায়
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ভৌতবিজ্ঞান
ইতিহাস
ছয়ের পাতায়
এডু টিপস
জেনারেল নলেজ
সাতের পাতায়
ক্যুইজ
এডু অ্যাডভাইস
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
বিলুপ্ত প্রাণী

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ জুন ২০১৭

আমাদের দেশের সংবিধান রচনা

বিদিশা রায়চৌধুরী

সংবিধান দেশের মৌলিক আইন। দেশের সরকারের মূলনীতিগুলো প্রতিফলিত হয় সংবিধানে। সংবিধান শুধু সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কাজকর্মের রূপরেখাই ঠিক করে না, বরং সরকারের সঙ্গে দেশের আম-জনতার সম্পর্ক কেমন হবে তাও বলে দেয়। ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের প্রায় সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই লিখিত সংবিধান আছে।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ স্থাপন করা হয়েছিল। এই গণপরিষদই ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা এবং প্রবর্তক। ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন আইন এবং সনদ এই সংবিধানের উপরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তাই বর্তমান ভারতের সংবিধান রচনার ইতিহাস আলোচনার আগেই সেই পুরনো সনদ ও আইনগুলির ইতিহাসও জেনে নেওয়া জরুরি।

সংবিধান রচনার পটভূমি

১৬০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রিটিশরা ভারতে আসে প্রথম বণিকের বেশে। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি সংস্থা চালু করেছিল। কোম্পানি রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে 'ইস্ট ইন্ডিজ' অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য করার অধিকার সনদ লাভ করে। প্রথম দিকে সনদের মেয়াদ ছিল পনেরো বছর। বলা হয়েছিল, সরকার বা ব্রিটিশ জনগণের কোনও ক্ষতি না হলে, সনদের মেয়াদ বাড়ানো হবে। সনদ পাওয়ার পর কোম্পানি স্থানীয় শাসকের কাছ থেকে জমি ও নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করে বাণিজ্য কুঠি ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। কোম্পানি পরিচালনার জন্য তাকে আইন, সংবিধান, আদেশ (অর্ডার) এবং অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারি করার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। ১৬০৯ ও ১৯৬১ সালের– সনদের পুনর্নবীকরণ করার পর কোম্পানির ইজারার মেয়াদ বর্ধিত হয়।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কোম্পানির ধ্যানজ্ঞান ঠিল মূলত বাণিজ্যই। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ভারতে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে কোম্পানি ভারতের প্রভু হয়ে বসে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে কোম্পানির জয়লাভ ভারতে কোম্পানির ভিতকে আরও সুদৃঢ় করে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি আদায় করে নেয়। এর ফলে কোম্পানি রাজস্ব আদায় ও বিচারবিভাগীয় কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ভারতের মাটিতে স্থাপিত হয় কোম্পানির সার্বভৌমত্ব।

ইতিমধ্যে কোম্পানির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রিটিশ সরকার একাধিক সনদ ও আইন পাস করে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আইন হল যথাক্রমে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং আইন, ১৭৯১ সালের সংশোধনী আইন, ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত আইন, ১৭৮৬ সালের আইন এবং ১৭৯৩, ১৯১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ সালের সনদ আইন। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরে কোম্পানির শাসনব্যবস্থা অবলুপ্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৮ সালের ভারত সরকার আইন অনুযায়ী ভারতের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেয়।

১৮৫৮ সালের পর ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন করার জন্য একাধিক আইন পাস করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের পাস করা ওই আইনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৬৯, ১৮৯২ ও ১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন এবং ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন। তবে এগুলির বেশিরভাগই ভারতীয়দের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে প্রশাসনিক কাজকর্মে ভারতীয়দের বৃহত্তর অংশগ্রহণের সুযোগ আদায়ের দাবিতে আন্দোলনও তীব্র করতে থাকেন নেতৃবর্গ।

১৯৩৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দাবি করে, কোনও রকম বিদেশি হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভারতীয়দের নিজেদের সংবিধান রচনার অধিকার দিতে হবে। জওহরলাল নেহরু প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি গণপরিষদ গঠনের দাবি জানান। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই দাবিতে কর্ণপাত করেনি। ১৯৪০ সালে পরিস্থিতির চাপে পড়ে ব্রিটিশরা স্বশাসিত ভারতের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনার অধিকার ভারতীয়দের দিতে রাজি হয়। ১৮৪২ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কিছু প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধের সময় যেনতেন প্রকারে ভারতের সহযোগিতা বজার রাখা। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব কংগেস বা মুসলিম লিগ কারও পক্ষেই মানা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৪ (সিআর ফর্মুলা) এবং ১৯৪৫ (ওয়াভেল পরিকল্পনা) সালে সাংবিধানিক জটিলতা কাটানোর চেষ্টা করা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি।

হস্তান্তরের পর গণপরিষদ সংবিধান ও আইন-প্রণেতার যৌথ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এইভাবে গণপরিষদই হয়ে ওঠে ভারতের প্রথম সনদ। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের এই কাজ চালিয়ে যায় গণপরিষদ।

সংবিধান রচনার ইতিহাস

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের অধীনে ভারতের গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮৯ (প্রদেশগুলির ২৯২ জন, দেশিয় রাজ্যগুলির ৯৩ জন, চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলির ৩ জন ও বালুচিস্তানে ১ জন)। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সভাপতি নির্বাচিত হন গণপরিষদের প্রবীণতম সদস্য ড. সচ্চিদানন্দ সিংহা ভারত বিভাগের পর মুসলিম লিগ তাদের সদস্যদের প্রত্যাহার করে নিলে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা কমে হয় ২৯৯ (প্রদেশগুলির ১২৯ জন ও দেশিয় রাজ্যগুলি থেকে ৭০ জন)। গণপরিষদ সংবিধান রচনার জন্য ১৩টি কমিটি গঠন করে। এই কমিটিগুলির রিপোর্ট অনুসারে ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের নেতৃত্বে একটি সাত সদস্যের খসড়া কমিটি সংবিধানে খসড়া প্রস্তুত করে।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে খসড়াটি প্রকাশিত হয় এবং দেশবাসীকে খসড়াটি নিয়ে আলোচনা ও সংশোধনী প্রস্তাবের জন্য আট মাস সময় দেওয়া হয়। ৭৬৩৫টি সংশোধনী প্রস্তাব আসে, যার মধ্যে ২৪৭৩টি আলোচনার পর বাতিল হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদের মোট ১১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী দেশবাসী, গণমাধ্যম, প্রাদেশিক আইনসভা ও গণপরিষদ কর্তৃক আলোচিত ও সংশোধনী হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ২৬ জানুয়ারি খসড়াটি সই করেন গণপরিষদের সভাপতি। গণপরিষদের অন্যান্য সদস্যরা খসড়াটিতে সই করেন ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি। সংবিধান কার্যকর করা হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। তবে নাগরিকত্ব, নির্বাচন, অন্তর্বর্তী সংসদ ও সাময়িক ও হস্তান্তরযোগ্য বিষয়গুলি ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বরই কার্যকর হয়ে যায়। এইভাবে দু'বছর এগারো মাস আঠারো দিনের প্রচেষ্টায় রচিত হয় ভারতের সংবিধান।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ জুন ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: কম্পিউটার

কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় টিপস

কম্পিউটারের কি-বোর্ড দিয়ে লেখার সময় আমাদের প্রায় সময়ই বিভিন্ন SYMBOL বা চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় কিন্তু আমাদের অনেকেই এই চিহ্নগুলো কীভাবে একটি নির্দিষ্ট লেখার ভিতর দিতে হয় তা জানি না। তাই আজ দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে খুব দ্রুত কি-বোর্ড দিয়ে শর্টকার্ট কি ব্যবহার করে যে কোনও লেখার ভিতর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় SYMBOL বা চিহ্ন দেওয়া যায়।

পাশে একটি তালিকা দিয়ে দেওয়া হল, যেখানে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় SYMBOL বা চিহ্নের শর্টকাট কি রয়েছে। লিস্টে দেওয়া নম্বরগুলো মনে রাখলেই খুব সহজে এই চিহ্নগুলো লেখার মাঝে SYMBOL ব্যবহার করতে পারা যাবে। তবে এর জন্য কি-বোর্ডের **Alt** বাটন চেপে ধরে রেখে কি-বোর্ডের ডানদিকের নিউমেরিক বাটনগুলো থেকে নম্বর ব্যবহার করতে হবে।

Alt + 0153	™	(trademark symbol)	Alt + 6	♠	(spade)
Alt + 0169	©	(copyright symbol)	Alt + 5	♣	(Club)
Alt + 0174	®	(registered trademark symbol)	Alt + 3	♥	(Heart)
Alt + 0176	°	(degre¬e symbol)	Alt + 4	♦	(Diamond)
Alt + 0177	±	(plus-or¬-minus sign)	Alt + 13	♪	(eighth note)
Alt + 0182	¶	(paragraph mark)	Alt + 14	♫	(beamed eighth note)
Alt + 0190	¾	(fractio¬n, three-fourths)	Alt + 8721	∑	(auto sum)
Alt + 0215	×	(multi¬plication sign)	Alt + 251	√	(square root check mark)
Alt + 0162	¢	(the cent sign)	Alt + 8236	∞	(infinity)
Alt + 0161	¡	(upside down exclamation point)	Alt + 24	↑	(up arrow)
Alt + 0191	¿	(upside down question mark)	Alt + 25	↓	(down arrow)
Alt + 1	☺	(smiley face)	Alt + 26	→	(right arrow)
Alt + 2	☻	(black smiley face)	Alt + 27	←	(left arrow)
Alt + 15	☼	(sun)	Alt + 18	↕	(up/down arrow)
Alt + 12	♀	(female sign)	Alt + 29	↔	(left right arrow)
Alt + 11	♂	(m¬ale sign)	Alt + 0128	€	(Euro)

উত্তরণ হেল্থ টিপস

গরমের মোকাবিলায় ফুড হ্যাবিট

হৈমন্তী দাস

শিক্ষা জীবনে সুস্থ শরীর ছাড়া উন্নতি যে কোনওভাবেই সম্ভব নয় তা সবার জানা। এর জন্যে শরীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস এসবের গুরুত্ব নিয়ে কম কথা আলোচনা হয়নি। কিন্তু বার বার খবরে বাচ্চাদের নানারকম অসুস্থতা ও তার থেকে হওয়া নানা বিপর্যয়ের কথা উঠে আসছে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান উপরন্তু এখানে জলীয় বাষ্পের মাত্রা বেশি। তাই জীবাণু সংক্রমণ ও তার থেকে তৈরি হওয়া নানা অসুখবিসুখের হার এখানে অনেক বেশি। এই গরমে ক্ষুধামান্দ্য, বদহজম, লেগেই থাকে। ডাইরিয়া, টাইফয়েডের ভয় সবসময় মনে লেগে থাকে। যে কোনও মা-বাবার কাছে বাচ্চার স্বাস্থ্য এই সময় একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। নিজের পড়াশোনার গতি ও ধারা ঠিকভাবে ধরে রাখতে কিছু বিষয়ে নজর রাখতেই হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যদি কিছু ভালো অভ্যেস তৈরি করে দেওয়া যায় তবে লড়াইটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

গরমকাল মানেই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের বংশ বৃদ্ধির আদর্শ সময়। এই সময় জল বাহিত রোগ যেমন টাইফয়েড, জন্ডিসের বাড়বাড়ন্ত থাকে। এই জীবাণুর আখড়া হয় রাস্তার ধারের ফুচকা, শরবত, ঠান্ডা জল আর নানা রকম কাটা ফল। স্কুলের পর বা টিফিনে অনেকেই এই ধরনের খাবারে অভ্যস্ত। ঠেলা না হলেও দোকানের বাসি বার্গার, স্যান্ডউইচ এসব ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয়। অনেক দোকান দাবি করতে পারে যে তাদের খাবার টাটকা কিন্তু সেক্ষেত্রেও কতটা মশলাদার বা খাবার তৈরিতে কতটা স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এরাও ঠেলাগাড়ির খাবারের থেকে কোনও অংশে ভালো এমন ভাবার ভুল না করাই ভালো। তাই ভুলেও গরমে কেনা খাবার মুখে তুলবেন না।

জল একমাত্র উপাদান যা শরীরকে তার স্বাভাবিকত্ব ধরে রাখতে সবথেকে বেশি সাহায্য করে। গরমে ঘামে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়। তাই গরমে শরীরের জলের প্রয়োজন বেড়ে যায়। যতই জল পিপাসা পাক বাড়ির পরিশ্রুত জল না থাকলে বাইরে মিনারেল ওয়াটার ছাড়া রাস্তার জল কখনও খাবেন না, এতে আপনি রোগে পড়তে পারেন। এমনকী সুস্থতার অজুহাতে কেনা শরবত, লস্যি, ফলের রস ও অন্যান্য পানীয়তে ব্যবহৃত জলের মান নিয়ে নিশ্চিত হয়ে তা পান করা উচিত।

গরমে ছোট-বড় সবারই একটা ঝোঁক থাকে ঠান্ডা জল খাওয়ার দিকে। কারণ স্বাভাবিক তাপমাত্রার জল এতটাই গরম থাকে তা খেলে মনে হয় গরম জল খাচ্ছি। কিন্তু কষ্ট হলেও নর্মাল জলই খাওয়া উচিত এই সময় কারণ ঘন ঘন ফ্রিজের ঠান্ডা জল সর্দি কাশি টনসিল সহ নানা রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। খুব গরমে ঠান্ডা জল মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই সময় দু' থেকে তিন লিটার জল খাওয়ার চেষ্টা করুন, এমনি জল খেতে ইচ্ছা না করলে শরবত, গ্লুকোজ বা লস্যি বানিয়ে খান। বিভিন্ন রকম তাজা ফলের জুস, ডাবের জলও খেতে পারেন। সকালে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে একগ্লাস তাজা ফলের জুস আপনার শরীরের টক্সিন দূর করবে। কাঁচা আম, বেলের শরবত এই সময় পেটের সমস্যা দূর করবে। পটাসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতেও শরবতের জুড়ি নেই। মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের এই ধরনের পানীয় বানিয়ে দিতে চাইলেও তারা অনেক সময়ে এই সব খেতে চায় না। তাদের বাজারে কেনা জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকে। কিন্তু এই বছর যদি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পালটানো যায় তাহলে এই উপদেশের কার্যকারিতা ভালোই টের পাওয়া যাবে।

সপ্তাহে এক দিনের বেশি মাংস না খাওয়াই ভালো। এই সময় এমন গরমে করলা, উচ্ছে, হেলেঞ্চা, পাট শাক এই সব বেশি করে খান। তেতো খাবারে থাকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা আপনার পাকস্থলির রোগ জীবাণু দূর করে। এছাড়াও শাক-সবজি খনিজ লবণের ঘাটতি, মিনারেলের অভাব আর বিভিন্ন ভিটামিনের কমতি পূরণ করে।

এই সময় সকালের ব্রেকফাস্টে তেলে-ভাজা পরোটার বদলে খাওয়ানো যেতে পারে

আটার রুটি বা চিড়ে দই। দুপুরের মেনুতে রাখুন শশা, টমেটো, গাজর, বিট, পুদিনা পাতা, লেটুস পাতা, লঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে বানানো এক বাটি স্যালাড, এক বাটি সবজি, মাছ, ডাল আর এক কাপ ভাত। রাতের খাবারেও রাখুন স্যালাড আর সবজি। দু'বেলার ভারী খাবারের মাঝে মাঝেও খাওয়ার চেষ্টা করুন স্যালাড। কিছু টোটকা বা চটজলদি উপায় মানলে গরমে মা-বাবাদের নিজেদের বা ছেলেমেয়েদের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কিছু কমে।

একগ্লাস জলে ৫/৭ টা কিশমিশ সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে জল সহ কিশমিশ খেয়ে ফেলুন এগুলো সারাদিন আপনার শরীরে শক্তি সঞ্চয় করবে আর থাকা যাবে সতেজ।

সারাদিন সতেজ থাকতে ডাল খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন সকালে টিফিনের সঙ্গে আধসিদ্ধ ডাল খেলে তা শক্তি সঞ্চয় করে শরীরের কর্ম ক্ষমতা বাড়ায়। দুপুরে খাবারের সঙ্গেও এটা খাওয়া যাতে পারে।

যে পড়ুয়ারা একটু বড় হয়েছ তাদের বলা যায় এই গরমে চা যদি খাও তবে তা হবে অবশ্যই গ্রিন টি। এটা শরীরের টক্সিন বার করে।

শরীরকে সতেজ রাখতে জল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। শরীরে যে কোনও সমস্যার সমাধানে জলের কোনও বিকল্প নেই। তাই চেষ্টা করুন ৩/৪ লিটার জল খাওয়ার।

শরীরকে সতেজ রাখতে লেবু খুব কার্যকরী। গরমে চিনি জল ও পুদিনার সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে শরবত করে খেতে দিন এতে আপনার সন্তানের শরীরে এনার্জি বাড়বে।

সন্তানের অনলাইন গতিবিধি লক্ষ রাখুন

প্রথম পাতার পর

নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

আসলে বেশিরভাগ সময়ে যেটা হয় সেটা হল অভিভাবকেরা সন্তানদের কোনও অন্যায় কার্যকলাপ দেখলে মাথার ঠিক রাখতে পারেন না। তখন কোনও জিনিস বুঝিয়ে বলার থেকে বেশি চলে তার ওপর অযথা বকাঝকা করা, যার ফল হয় মারাত্মক। কিন্তু সমাজে সব জিনিসেরই যেমন ভালো-খারাপ আছে, তেমনি ইন্টারনেটেরও এই দুই দিক বর্তমান। সেইভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের ভালো ও খারাপ দিক গুলো তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত। যাতে সে সমস্ত দিক সম্পর্কে আগে থেকেই তার মতো করে বুঝে নিতে পারে। এর ফলে সমস্যা আর বৃদ্ধি পাবে না। অভিভাবকদের সঙ্গেও সন্তানের একটি সুসম্পর্ক তৈরি হবে। যত একটি বাচ্চাকে কোনও জিনিস থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে তত তার মধ্যে কৌতূহল বাড়বে, তার থেকে ভালো হয় একজন সন্তান আর অভিভাবকের মধ্যে কোনও দূরত্ব না রেখে ভালো পরস্পরের মধ্যে নির্ভরতা তৈরি করা।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ জুন ২০১৭

তোমাদের প্রিয় ‘উত্তরণ’-এ **‘আমার স্কুল’** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো ‘CONTENT FOR AAMAR SCHOOL’
মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ**

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভৌতবিজ্ঞান

তরল ও বায়ুর চাপ

তরল ও বায়ুর চাপ: যা প্রবাহিত হতে পারে তাকে প্রবাহী বলা হয়। তরল এবং গ্যাস প্রবাহিত হতে পারে, তাই তরল এবং গ্যাসকে একত্রে প্রবাহী বলে। প্রবাহীর নিজস্ব কোনও আকার, আকৃতি বা দৃঢ়তা নেই।

ঘাত: একটি তলের কোনও ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে যে মোট বল প্রযুক্ত হয় তাকে ঘাত বলে। ঘাত একটি বল হওয়ায় সেটি হল একটি ভেক্টর রাশি। ঘাত-এর পরম একক এসআই পদ্ধতিতে নিউটন এবং সিজিএস পদ্ধতিতে ডাইন। ধরা যাক, টেবিলের উপর একটি বস্তু রাখা হয়েছে। বস্তুটির ওজন টেবিলের তলের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করে। এক্ষেত্রে বস্তুটির ওজন বল হল একপ্রকার ঘাত।

চাপ: কোনও তরলের প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলের মানকে ওই তলের উপর চাপ বলা হয়। অর্থাৎ কোনও তলের প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত ঘাত হল ওই তলের উপর চাপ। সুতরাং চাপ = ঘাত/ক্ষেত্রফল।

চাপের মান দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

১) প্রযুক্ত বলের উপর, ২) যে ক্ষেত্রফলের উপর বল ক্রিয়া করে তার উপর।

চাপের উদাহরণ: সমতল রাস্তায় হাঁটলে পায়ে লাগে না, কিন্তু সুঁচলো পাথরের টুকরোর উপর হাঁটলে পায়ে লাগে। এর কারণ হল, পা এবং সমতল রাস্তার স্পর্শতলের ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ায় এবং তার উপর মানুষের দেহের ওজন ক্রিয়া করায়, প্রযুক্ত চাপ কম হয়। কিন্তু সুঁচলো পাথরের উপর পা পড়লে ক্ষেত্রফল কম হয় এবং চাপ বেশি হয়।

প্রবাহীর মধ্যে কোনও বিন্দুকে ঘিরে একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রবাহী লম্বভাবে যে বল প্রয়োগ করে, তাকে ওই বিন্দুতে প্রবাহীর চাপ বলে। প্রবাহীর মধ্যে কোনও বিন্দুতে চাপ সবদিকে সমানভাবে ক্রিয়া করে,এর কোনও নির্দিষ্ট অভিমুখ নেই। তাই চাপ একটি স্কেলার রাশি।

তরলের চাপের প্রকৃতি :

১) স্থির তরলের মধ্যে কোনও বিন্দুতে তরল সবদিকে সমান চাপ প্রয়োগ করে।

২) স্থির তরলের মধ্যে একই আনুভূমিক তলে সব বিন্দুতেই চাপ সমান হয়।

৩) কোনও একটি তরলে গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপও বৃদ্ধি পায়।

৪) একই গভীরতায় বিভিন্ন তরলে চাপ তার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

ব্যারোমিটার: যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপা হয় তাকে ব্যারোমিটার বলে।

একটি সমব্যাসের এক মিটার দীর্ঘ, একমুখ বন্ধ কাচ নল। নলটি শুষ্ক এবং পরিষ্কার পারদ দিয়ে পূর্ণ করে, পারদপূর্ণ পাত্রের ভিতর খোলা মুখটি ঢুকিয়ে উপুড় করে রাখা থাকে। পারদপূর্ণ এই পাত্রের উপরের অংশ কাচ দিয়ে ঘেরা এবং নীচের অংশটি পিতলের তৈরি। কাচ নলটি একটি পিতলের নলের মধ্যে থাকে। পিতলের নলের উপরের দিকে

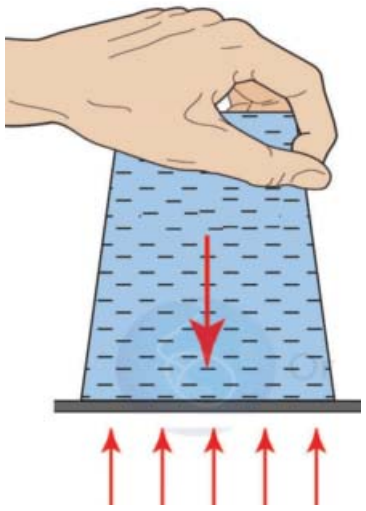

থাকা কাটা অংশের মধ্যে দিয়ে কাচনলের ভেতরের পারদতল দেখা যায়। পাত্রের নীচে থাকা স্ক্রুয়ের সাহায্যে পাত্রের তলায় থাকা চামড়ার থলির আয়তন পরিবর্তন করা যায়। তার ফলে পাত্রের পারদতলের উচ্চতা বাড়ে বা কমে। পাত্রের পারদতলের উপরে আইভরি পিন থাকে। পিতলের নলের গায়ে একটা স্কেল থাকে, যার ০ দাগের সঙ্গে আইভরি পিনের অগ্রভাগ এক লেভেলে থাকে। স্কেলের সঙ্গে ভার্নিয়ার স্কেলও রাখা থাকে। স্ক্রু ঘুরিয়ে ভার্নিয়ার স্কেলকে এমন জায়গায় আনতে হবে যে তার নীচের অংশ ০ দাগ পারদস্তম্ভের উত্তল তলের স্পর্শক হয়।

ব্যারোমিটারের সাহায্যে চাপ নির্ণয়: প্রথমে স্ক্রুকে ঘুরিয়ে পারদপাত্রের পারদতলকে আইভরি পিনের সঙ্গে স্পর্শ করাতে হবে। এর ফলে পারদতল স্কেলের ০ দাগের সঙ্গে এক লেভেলে থাকবে। এবার স্ক্রু ঘুরিয়ে ভার্নিয়ারের ০ দাগকে পারদস্তম্ভের উত্তল তলের সঙ্গে স্পর্শ করতে হবে। এবার মূল স্কেল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ নিয়ে পারদস্তম্ভের উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে। এই উচ্চতা থেকে ওই স্থানের বায়ুর চাপ পাওয়া যাবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

১) পারদস্তম্ভের উচ্চতা ধীরে ধীরে কমতে থাকলে বুঝতে হবে যে শীঘ্র বৃষ্টি হতে পারে। কারণ উচ্চতা কমে যাচ্ছে মানে বায়ুর চাপ কমছে। এটা হয় যখন বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প বাড়ে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প বেশি হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

২) পারদস্তম্ভের উচ্চতা যদি দ্রুত কমে যায় তাহলে বুঝতে হবে ঝড়ের সম্ভাবনা আছে। কারণ উচ্চতা দ্রুত কমার অর্থ বায়ুর চাপ হঠাৎ কমে গেছে সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপের স্থান থেকে বায়ু প্রবলবেগে ওই স্থানের দিকে ধাবিত হবে।

৩) পারদস্তম্ভের উচ্চতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে বুঝতে হবে আবহাওয়া শুষ্ক এবং পরিষ্কার থাকবে। উচ্চতা বাড়ার অর্থ হল বায়ুর চাপ বাড়ছে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প কমে গিয়ে শুষ্ক বায়ু ঢুকছে।

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: জীবন বিজ্ঞান

উদ্ভিদ কলা

আগের টিউশনে আমরা উদ্ভিদ কলার ভাগগুলো নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছি। তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু জটিল কলার জাইলেম আর ফ্লোয়েম কলা নিয়ে আরও কিছু কথা আলোচনার প্রয়োজন আছে যা বাকি থেকে গিয়েছে।

মনে করিয়ে দিই যে জাইলেম আর ফ্লোয়েম আসলে জটিল স্থায়ী কলা। এই কলায় বিভিন্ন আকৃতি সম্পন্ন কোষ উপাদান একত্রে এক রকমের কাজ করে। তাই বলা যায় এদের গঠনগত উপাদান ভিন্ন। গঠনগত বিভেদের কারণে এই জটিল কলা দুটির আবার কিছু ভাগ আছে। সেগুলো নিয়ে আজ একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

জাইলেম কলায় শুধুই জাইলেম প্যারেনকাইমা জীবিত কলা, বাকি সবাই মৃত তাই একে মৃত কলা বলে। আবার অন্যদিকে ফ্লোয়েম কলায় শুধু ফ্লোয়েম তন্তু মৃত তাই ফ্লোয়েম কলাকে জীবিত কলা বলে।

প্রথমে আমরা জাইলেম কলা নিয়ে জানব। কোষীয় উপাদান অনুসারে এর ভাগ চারটি— ট্র্যাকিড (Tracheid), ট্র্যাকিয়া (Trachea), জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenochyma) ও জাইলেম তন্তু (Xylem fibre)। এই নামগুলো আমরা আগেই জেনেছি, এবার এদের বৈশিষ্ট্য জানব।

ট্র্যাকিড: জাইলেম কলায় অবস্থিত এই কোষগুলোর আকৃতি ছুঁচলো আর লম্বা। এদের কোষপ্রাচীরে সোপানাকার, বলয়াকার, সর্পিলাকার বা কূপাকৃতি অলংকরণ দেখা যায়। এরা মৃত কোষ। এদের মাধ্যমে উদ্ভিদ জল সঞ্চয় করে। এছাড়া এরা গাছকে দৃঢ়তা দেয়। সাধারণত ব্যক্তবীজী, গুপ্তবীজী বা ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের মূল বা কাণ্ডের জাইলেম কলায় এই প্রকারের কোষ থাকে।

ট্র্যাকিয়া: জাইলেম কলার যে কোষগুলো নলাকার আর প্রান্তপ্রাচীর বা বাইরের কোষপ্রাচীর নেই তাদের ট্র্যাকিয়া বলে।

এরাও মৃত। এরা জল ও খনিজ লবণ সংবহন করে বলে এদের জাইলেম বাহিকা বলে। কোষপ্রাচীর থাকলে সেখানে ট্র্যাকিডের মতো অলংকরণ দেখা যায়। এদের প্রাধানত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলায় দেখা যায়। তবে নিটাম নামের ব্যক্তবীজী গাছে এই কোষ দেখা যায়।

জাইলেম প্যারেনকাইমা: এই কোষ সব ব্যক্তবীজী (ব্যতিক্রম পাইনাস) ও সব গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলাতেই থাকে। এরা জীবিত কোষ। এদের কোষপ্রাচীর পাতলা তাই প্রাচীরে কোনও অলংকরণ দেখা যায় না। এরাই একমাত্র জীবিত কোষ। এরাও জল আর খনিজ লবণ সংবহন করে।

জাইলেম তন্তু: এরা আসলে জাইলেম কলায় অবস্থিত মৃত স্কেরেনকাইমা তন্তু। এদের জাইলেম তন্তু বা কাষ্ঠল তন্তুও বলে। এদের কোষপ্রাচীরে সপাড় কূপ (ট্র্যাকিড তন্তু) বা সরল কূপ (লিব্রিফর্ম তন্তু) থাকে। এরা জল ও খনিজ লবণ সংবহনের সঙ্গে জল ও খাদ্য সঞ্চয় করে। এরাও উদ্ভিদকে দৃঢ়তা দেয়। এটাই এদের মূল কাজ। ব্যক্তবীজী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের জাইলেম কলায় জাইলেম তন্তু থাকে।

এবার ফ্লোয়েম কলা সম্পর্কে কিছু কথা বলার আছে। ফ্লোয়েম কলার কোষীয় উপাদান অনুসারে ভাগ করলে চার রকমের কোষ পাওয়া যায়। সিভনল (Sieve tube), সঙ্গীকোষ (Companion cell), ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchyma) আর ফ্লোয়েম তন্তু (phloem fibre)। আবার মনে করিয়ে দিই এই নামগুলো তোমরা আগেই পড়েছ। এবার এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। এরা আসলে ফ্লোয়েম কলাতে অবস্থিত। এদের গঠনগত আর কার্যগত উপাদান ভিন্ন।

সিভনল: সিভনল কোষগুলো নিউক্লিয়াসবিহীন। এদের আকৃতি নলাকার। এদের মধ্যে সিভপ্লেট থাকে। এরা সজীব কোষ। এরা খাদ্য সংবহন আর সঞ্চয় করে। সাধারণত সব রকমের গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় এই প্রকারের কোষ দেখা যায়।

সঙ্গীকোষ: এরা সিভনলের সংলগ্ন অবস্থায় থাকে। এরা আসলে প্রোটোপ্লাজমযুক্ত প্যারেনকাইমা কোষ। এরা খাদ্য সংবহনে সাহায্য করে। এদের গুপ্তবীজী, ব্যক্তবীজী (ফার্ন, নিটাম ব্যতীত) উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় দেখা যায়। এরাও জীবিত কোষ।

ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা: গুপ্তবীজী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা দেখা যায়। ফ্লোয়েম কলায় লম্বভাবে এই কোষগুলো সাজানো থাকে। এদের আকৃতি বেলনাকার। এরা বিভিন্ন জৈব বস্তুর সংবহন ও সঞ্চয়ে সাহায্য করে। এই কোষগুলোও জীবিত প্রকৃতির।

ফ্লোয়েম তন্তু: এরা ফ্লোয়েম কলায় উপস্থিত একমাত্র মৃত কোষ। এরা তাই ফ্লোয়েম কলার সাধারণ কাজের বদলে উদ্ভিদ অঙ্গে দৃঢ়তা দেয়। গুপ্তবীজী উদ্ভিদে এদের দেখা যায়। এদের বাস্ট তন্তুও বলে। এরাও আসলে ফ্লোয়েম কলায় অবস্থিত স্কেরেনকাইমা তন্তু। অবস্থানের জন্য এদের নাম পালটেছে।

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ জুন ২০১৭

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভৌতবিজ্ঞান

গ্যাসের প্রসারণ

তাপ প্রয়োগে কঠিন ও তরল পদার্থের মতো গ্যাসেরও প্রসারণ হয়। গ্যাসের নিজস্ব কোনও আকার না থাকায় এর দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্র প্রসারণ অর্থহীন, কেবলমাত্র আয়তন প্রসারণ সম্ভব হয়। তাপ প্রয়োগে গ্যাসের প্রসারণ কঠিন বা তরল পদার্থের প্রসারণের চেয়ে অনেক বেশি। আবার সমান তাপমাত্রাভেদে সব গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সমান হয়।

তাপ প্রয়োগে যে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ হয় তা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রত্যক্ষ করি। মেলাতে বায়ু বা যে কোনও হালকা গ্যাস দিয়ে বেলুন ফোলানো আমরা সবাই দেখেছি। গরমকালে অনেক সময় দেখা যায় খোলা জায়গায় রাখা সাইকেলের টায়ার-টিউব ফেটে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে। সাইকেলের টিউবের মধ্যে থাকা বায়ু বায়ুমণ্ডল থেকে তাপ পেয়ে আয়তনে প্রসারিত হয়ে টায়ার-টিউবকে ফাটিয়ে দেয়। গ্যাসের প্রসারণের এরকম অনেক ঘটনা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে লক্ষ করি।

চার্লসের সূত্র ও স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক:

চার্লসের সূত্র: চাপ স্থির থাকলে কোনও নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য ওই গ্যাসের 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আয়তনের 1/273 অংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।

গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক: স্থির চাপে কোনও নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের উষ্ণতা 0 ডিগ্রি থেকে 1 ডিগ্রি বৃদ্ধি করলে এর প্রতি একক আয়তনে যে আয়তন বৃদ্ধি হয় তাকে ওই গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলে।

তাপের পরিবহণ : দুটি বস্তুর মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য থাকলে উষ্ণতর বস্তু থেকে শীতলতর বস্তুর দিকে তাপ প্রবাহিত হয়। আবার একই বস্তুর উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশেও তাপের সঞ্চালন হয়।

একস্থান থেকে অন্যস্থানে তাপের চলাচলকে তাপ সঞ্চালন বলে। তাপ সঞ্চালনের তিনটি পদ্ধতি আছে। ১) পরিবহণ (conduction), ২) পরিচলন (convection), ৩) বিকিরণ (radiation)।

পরিবহণ : যে পদ্ধতিতে কোনও পদার্থের উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে তাপ সঞ্চালিত হয় কিন্তু পদার্থের অণুগুলির স্থানচ্যুতি ঘটে না তাকে পরিবহণ বলে। সাধারণত কঠিন পদার্থে তাপের সঞ্চালন পরিবহণ পদ্ধতিতে হয়। তাপ পরিবহণের ক্ষমতাকে পদার্থের তাপ পরিবাহিতা বলে। সব পদার্থের তাপ পরিবাহিতা সমান নয়।

প্রায় সব ধাতুই তাপের সুপরিবাহী। রুপোর তাপ পরিবহণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। কাঠ, কাচ, কাগজ, কাপড়, রবার, তুলো, কর্ক প্রভৃতি তাপের কুপরিবাহী।

একটি লোহার দণ্ডের একপ্রান্ত হাত দিয়ে ধরে অন্যপ্রান্তটিকে আগুনের মধ্যে রাখলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে হাতে গরম লাগছে এবং দণ্ডটিকে হাতে ধরে রাখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে তাপ আগুনে রাখা প্রান্ত থেকে দণ্ডের মধ্য দিয়ে অপর প্রান্তে যাচ্ছে। একেই বলে তাপের পরিবহণ।

তাপ পরিবাহিতাঙ্ক: কোনও পদার্থের একক বেধ ও একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি পাতের দুই বিপরীত পৃষ্ঠের উষ্ণতার পার্থক্য এক ডিগ্রি হলে পাতের এক পৃষ্ঠ থেকে অপর পৃষ্ঠে লম্বভাবে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ তাপ পরিবাহিত হয় তাকে ওই পদার্থের তাপ পরিবাহিতাঙ্ক বলে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা:

১) একই আয়তনের একটি তামার পাত এবং একটি লোহার পাতকে রিভেট করে যুক্ত করা হল। এই সমবায়টিকে উত্তপ্ত করলে কী ঘটবে তা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: তামা ও লোহার যুগ্ম পাতটিকে উত্তপ্ত করলে পাতটি সোজা না থেকে বেঁকে যাবে। তামা ও লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সমান হলে পাতটি সোজা থাকত। কিন্তু তামার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক লোহার চেয়ে বেশি বলে তামার পাতের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বেশি হবে। এই অসম প্রসারণের ফলে দৃঢ়ভাবে যুক্ত পাত দুটি দিয়ে তৈরি যুগ্ম পাতটি বেঁকে যাবে।

২) কোনও তরলপূর্ণ পাত্রকে হঠাৎ উত্তপ্ত করা হলে তরলের তল প্রথমে কিছুটা নেমে যায়, কিন্তু পরে আবার ওপরে ওঠে, এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: তরলপূর্ণ পাত্রকে হঠাৎ উত্তপ্ত করলে প্রথমে পাত্র তাপ পেয়ে আয়তনে প্রসারিত হয়। পাত্রের তরলের উষ্ণতার বিশেষ পরিবর্তন হয় না, তাই তার আয়তন মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। সেজন্য পাত্রে তরলের তল কিছুটা নেমে যায়। কিন্তু ক্রমাগত তাপ দিতে থাকলে পাত্রের তরল ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয় এবং আয়তনে প্রসারিত হয়। সাধারণত কঠিনের চেয়ে তরলের প্রসারণ বেশি। তাই কিছুক্ষণ পরে তরলের তল ওপরের দিকে উঠতে থাকে।

৩) তামার তাপ পরিবাহিতাঙ্ক 0.92CGS unit বলতে কী বোঝো?

উত্তর: 'তামার তাপ পরিবাহিতাঙ্ক 0.92CGS unit' বলতে বোঝায়, এক সেন্টিমিটার বেধ ও এক সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি তামার পাতের দুই বিপরীত পৃষ্ঠের উষ্ণতার পার্থক্য 1 ডিগ্রি C হলে এক সেকেন্ড সময়ে 0.92 ক্যালোরি তাপ উষ্ণপৃষ্ঠ থেকে শীতলপৃষ্ঠে লম্বভাবে প্রবাহিত হবে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ইতিহাস

উনিশ শতকের বাংলা: সমাজ সংস্কার

আমরা পড়ছিলাম উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের থেকেই আসে চেতনা, আর চেতনা থেকে আসে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমাজ সংস্কার। এই সমাজ সংস্কারের পিছনে কিছু যুক্তিও কাজ করছিল: ১) পাশ্চাত্য শিক্ষার যুক্তিবাদী প্রভাব সমাজের উপর পড়ে, ২) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের অংশগ্রহণ, ৩) কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৪) সংকীর্ণ জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ, কৌলীন্য প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ৫) রক্ষণশীলতা ও পুরোহিত প্রভাবিত সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার, ৬) সমস্ত গোঁড়ামি ও রক্ষণশীল ঐতিহ্যের মূলে আঘাত করে পুরনো সমাজ কাঠামো ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তোলা, ৭) মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, বাস্তববাদ, বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে বপন করা, ৮) সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত প্রকার সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে প্রেরণা দেওয়া।

ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগ: ব্রাহ্মসমাজই প্রথম উনিশ শতকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে সামাজিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়। ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী সদস্যরা বেদ-উপনিষদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত হয়। একে বলা হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতপাত ও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থী রাধাকান্ত দেব সতীদাহের অবসানে আপত্তি তোলেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের মতবিরোধ হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের হাল ধরলেও পুরোপুরি উদার হতে পারেননি। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের নিয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে সমন্বয়ী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পত্তন করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ ও নৈশ বিদ্যালয় গঠনেও উদ্যোগ নেন। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে কর্মসূচি নেন। কেশবচন্দ্র বাল্যবিবাহের বিরোধী হয়েও নিজের চোদ্দ বছর বয়সি কন্যা সুনীতিদেবীকে কুচবিহারের আঠেরো বছর বয়সি রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তিনি আইন লঙ্ঘন করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসন্তুষ্ট শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেন।

সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন: খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতে নারী কল্যাণে উদ্যোগী হয়ে প্রথম সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত করতে ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিয়েছিলেন। সতীদাহ প্রথার মূলকথা হল, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর চিতায় সদ্য বিধবা স্ত্রীকে দাহ করা। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে ১৫ বছর ধরে আন্দোলন করেন। কিন্তু বর্ণহিন্দুরা একে ধর্মীয় প্রথা বলে প্রচার করায় আন্দোলন সত্ত্বেও সতীদাহ প্রথা রদ করা যাচ্ছিল না। রামমোহন রায় ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসার পর সতীদাহ নিয়ে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তারপর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কেরি সরকারকে তদন্তের অনুরোধ জানান। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা রদ করেন। মূলত, রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধেই বেন্টিঙ্ক সতীদাহ রদ করেন। কারণ তাঁর আগে খ্রিস্টান মিশনারি, সরকারি রাজকর্মচারী, ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে রামরাম বসু ও ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করলেও, রামমোহনই প্রকৃত আন্দোলন শুরু করেছিলেন। রামমোহন লোকশিক্ষার মাধ্যমে এই প্রথার বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগ্রত করেছিলেন।

নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী: হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও যে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন তার নাম নব্যবঙ্গ বা ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন। কিছুদিন ভাগলপুরে পড়াশোনার পর তিনি ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের ইতিহাস ও ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তিনি একাধারে ছিলেন ছাত্রদের শিক্ষক ও বন্ধু। তাঁর অনুগামীদের বলা হয় ডিরোজিয়ান। এঁদের বেশিরভাগই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। অনুগামীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, লালবিহারী দে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ি, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরাই হলেন নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী। ডিরোজিও মাত্র ২৩ বছর বয়সে মারা যান। নব্যবঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতি-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। নব্যবঙ্গ দলের র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনকে ধ্বংস করতে অসংখ্য মানুষ এর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। ডিরোজিও তাঁর এন্টালির বাসভবনে গড়ে তুলেছিলেন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। তিনি 'পার্থেনন', 'হেসাপেরাস', 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট', 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিন', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। তিনি জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, উচ্চবর্ণের প্রাধান্য, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, কিন্তু ডিরোজিওর অনুগামীরা উদার সংস্কারের নামে মদ্যপান, গো-মাংস ভক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে নৈতিক অধঃপতনের পরিচয় দেন।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন: বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মূল রূপকার হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ২১ বছর বয়সে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদবিষয়ক মন্তব্য' নামে একটি বইও লেখেন। ৯৮৭ জন পণ্ডিতদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদনপত্র বিধবাবিবাহের পক্ষে সংগ্রহ করে লর্ড ক্যানিং-এর কাছে জমা দেন বিদ্যাসাগর। তাতে সম্মতি জানিয়ে 'পঞ্চদশ আইন'-এর দ্বারা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস করেন লর্ড ক্যানিং। তৈরি হয় 'বিধবা হোম', 'হিন্দু উত্তরাধিকার আইন' ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর তাঁর পুত্র ঈশানচন্দ্রকে ভবসুন্দরী নামে এক বিধবার সঙ্গে প্রথম বিবাহ দেন। এটিই ছিল বাংলার প্রথম বিধবাবিবাহের ঘটনা।

বিধবাবিবাহের পক্ষে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছিলেন কলকাতার নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের বড় সমর্থক বর্ধমানের রাজা এই আন্দোলনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ জুন ২০১৭

এডু টিপস

পড়তে বসলেই ঘুম পায়?

তনুশ্রী দাস

সারাদিন স্কুল বা কলেজ, তারপর টিউশন তারপর বাড়িতে নিজের পড়া করা সব মিলিয়ে সারাদিন এত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটে যে শরীর ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক। আজকাল তো আবার একেবারে ছোট ক্লাস থেকে এমন পড়ার চাপ যে শুধু বাচ্চাদের না বাবা মায়েরও ঘুম উড়ে যাওয়ার উপক্রম। ছুটিও আগের তুলনায় কমে গেছে অনেক। এই সবের মধ্যে বাচ্চাদের ঘুমের সময়টাও যেন অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু ঘুম তো বাধ মানবে না তাই এসে হাজির হয় পড়তে বসলেই। এ এক মহা সমস্যা। যাই করি না কেন ঘুম আসে না আসে বই খুলে বসে দু-লাইন পড়তে না পড়তেই।

প্রথমে জানতে হবে কেন এমনটা হয়? তাহলে মোকাবিলা করা সহজ হবে, আর অযথা বকুনিও জুটবে না। আসলে পড়ার সময় আমাদের চোখের পাতার ওঠা নামা ছন্দবদ্ধ হয়। আর শরীর রিল্যাক্সড মুডে থাকে। তাই এতে শরীরে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা হল ঘুমের আগের অবস্থা। ফলে আস্তে আস্তে ঘুম পেয়ে যায়। অবশ্য পরীক্ষার আগে আমাদের পরীক্ষার টেনশন থাকে তাই যত রাত অবধিই পড়া হোক ঘুম আসে না। তবে যে বিষয়গুলোতে আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয় যেমন অঙ্ক করা, কোনও বিষয়ের কারণ নির্ণয় করা বা নিজের পছন্দের কোনও বিষয় পড়া অথবা এমন কিছু পড়া যেটাতে উৎসাহ আছে সেক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্ক সজাগ থাকে। তখন সহজে ঘুম আসে না। আর তাছাড়া শারীরিক শ্রম দিয়ে কাজ করার থেকে মন দিয়ে কোনও কাজ করলে, যেমন পড়াশোনা সেটা যেমন ক্লান্তিকর কাজ হয় তেমন কিছুটা একঘেয়েও হয় তাই তাড়াতাড়ি ঘুম আমাদের চোখ কবজা করে নিতে পারে।

এবার আসি মোকাবিলার কথায়। প্রথম উদ্দেশ্য হল ঘুম পর্যাপ্ত করা যাতে পড়ার সময়ে শরীরে শক্তি টিকে থাকে। শরীরের মতো মস্তিষ্কেরও বিশ্রাম দরকার। শুয়ে বসে থাকলে শরীরের আরাম হয় কিন্তু মাথার আরামের জন্যে ঘুম সব থেকে ভালো। এর থেকে মুক্তি পেতে প্রথমে একটা নিয়মের মধ্যে আসতে হবে। দিনে যেভাবেই হোক আট ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। আর ঘুমের সময় কোনও দুশ্চিন্তা চলবে না। ঠিক করা সময়ের মধ্যে যদি পড়া শেষ না করতে পারলে, পরের দিন শুরুতেই সেটা করে নেওয়া ভালো।

এ তো গেল ঘুমের কথা। তা সত্ত্বেও ঘুম পেলে তাহলে একটু পায়চারি করা যেতে পারে, জল বা চা-কফি খেলেও ঘুম কাটবে। ঘুম তাড়াতে চোখে মুখে জলের ঝাপটাও কাজে আসে। যদি ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তবে একটু মনটা একটু পালটে নেওয়া ভালো। যেমন— বসার ধরন পাল্টানো বা একটু অন্য কোনও বই নাড়াচাড়া করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বাড়ির লোকের সঙ্গে একটু কথা বলা বা মুখরোচক কিছু খেয়েও মন পরিবর্তন করা যেতে পারে। বাদাম, বিস্কুট, ফলের টুকরো-এতে শরীরে এনার্জি পাওয়া যায়, ঘুম কাটে।

কিন্তু ঘুম কাটাতে গান শোনা, টিভি দেখায় উপকার হয় না। কারণ এতে মস্তিষ্ক আরও ক্লান্ত হয় বা কাজ না করার কারণে নিস্তেজ হতে থাকে। আরও জোরদার ঘুম পেতে থাকে। উলটে টিভি দেখা বা গান শোনায় কান আর চোখ আরও ক্লান্ত হয়ে যায়।

ঘুম তাড়াতে রাতের ঘুমটা ভালোমত ঘুমোনোর চেষ্টা করা উচিত। সারাদিন অল্প অল্প করে চার থেকে পাঁচবার খাবার খাওয়া উচিত। বেশি খাবার ঘুম বাড়ায়। তাই বেশি খাবার একদম না। অল্প করে বারে বারে খেতে হবে। মাংস, মিষ্টি, ভাত, আম-এগুলো ঘুম বাড়ায়। ঘুম বাড়ানো খাবার কমিয়ে দিলে লাভ হবে। শুয়ে শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস বাদ দিতে হবে এতে শরীরে ক্লান্তি তাড়াতাড়ি আসে।

জেনারেল নলেজ

মনভোলানো কুকুর

সন্দীপ চৌধুরী

মানুষের সবথেকে প্রিয় পোষ্য বোধ হয় কুকুর। এদের জাতি-প্রজাতি, দাম এসব জানলে অবাক হতে হয়। এদের রূপে গুণে মন ভুলে যায়। ভালোবাসায়, আদরে, বন্ধুত্বে এদের জুড়িমেলা ভার। আজ কিছু বিশেষ প্রজাতির কুকুর নিয়ে আমরা জানব। কুকুর কার্নিভোরা (Carnivora) অর্থা শ্বাপদ বর্গভুক্ত এক প্রকারের মাংসাশি স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রায় ১৫ হাজার বছর আগে একপ্রকার নেকড়ে মানুষের শিকারের সঙ্গী হওয়ার মাধ্যমে গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়। তবে কারও কারও মতে কুকুর মানুষের বশে আসে ১০০,০০০ বছর আগে। অবশ্য অনেক তথ্যসূত্র অনুযায়ী কুকুরের গৃহপালিতকরণের সময় আরও সাম্প্রতিক বলে ধারণা প্রকাশ করে থাকে। নেকড়ে ও শিয়াল কুকুরের খুবই ঘনিষ্ঠ প্রজাতি (নেকড়ে আসলে একই প্রজাতি)। তবে গৃহপালিত হওয়ার পরে কুকুরের বহু বৈচিত্র্যময় জাত (breed) তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উচ্চতার কুকুর (যেমন চিহুয়াহুয়া) থেকে শুরু করে তিন ফুট উঁচু (যেমন আইরিশ উলফহাউন্ড) রয়েছে। কিছু প্রজাতি প্রকৃতিকভাবে সৃষ্ট আর কিছু প্রজাতি তৈরিতে মানুষের ভূমিকা রয়েছে।

কুকুরেরা যখন লেজ নাড়তে নাড়তে পায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়, নাক-মুখ ঘষে তখন তাদের যাই চেহারা হোক আমাদের মন গলে যায়। কিন্তু সবাই শুধু নিরীহ প্রভুভক্ত প্রাণী নয়। কারওর কারওর তেজ, সাহস, যুদ্ধের ক্ষমতা ও বুদ্ধি তাক লাগানোর মতো। তবে তারা সবাই যে শুধু ভালোবাসতে জানে তা নয়, ভালোবাসা আদায় করার কৌশলটাও এদের ভালো জানা। তাই তো চারপেয়ে বন্ধুটি হঠাৎ অসুখে পড়ে 'কুই কুই' ডাকলে কেমন মন খারাপ হয়ে যায় বাড়ির সদস্যদের! যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কুকুর পোষেন, তাদের সঙ্গে কুকুরের ভাবের আদান-প্রদান কোনও মানুষের থেকে কম হয় না।

সারাইল হাউন্ড

এই কুকুরগুলো অবয়বের দিক থেকে গ্রেহাউন্ড-এর মতো। এরা ১১ বছর গড় আয়ুর, আর মাঝারি সাইজের কুকুর। তাই এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কেউ যদি এদের বাচ্চা অবস্থায় নিয়ে আসেন তবে অনেক সময় ধরে এদের পুষতে পারবেন। এদের কিছুটা দুর্বল মনে হতে পারে কিন্তু এরা খুবই কর্কশ (যেহেতু এরা বন্য কুকুরের সঙ্গে মিক্সড) এবং অনেক বেশি অনুগতও। এরা যেহেতু অনেক বেশি হারে হারিয়ে যাচ্ছে তেমনি এদের আবার প্রচুর পরিমাণে জন্মানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

পমারেনিয়ান

এই ছোট কুকুরগুলো কুকুরছানা হিসেবে অনলাইনে বিক্রি করতে প্রায় দেখা যায়। এগুলো খুঁজে পাওয়াও খুব সহজ। যেহেতু এ কুকুরগুলো খুব ছোট (প্রায় ২ কেজি) তাই এগুলো আপনার সঙ্গে এবং বাড়িতে পোষা খুব সহজ। ছোট জায়গার জন্য এরা উপযুক্ত। পি প্যাডেই এদেরকে হাউজট্রেন্ড করা যায়। পোমেরানিয়ানরা খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং একজনের সঙ্গে লেগে থাকার জন্যে বেশ পরিচিত। তাদের আকারই বলে দেয় এদের জন্যে তেমন খাবারের প্রয়োজন হয় না। তাই এদের পোষা তেমন ব্যয়বহুল না।

ইন্ডিয়ান পারিয়াহ কুকুর

ইন্ডিয়ান পারিয়া কুকুর মাঝে মাঝে বন্য অথবা পাশবিক হিসেবে দেখা যায় এবং এদের সর্বত্র পাওয়া যায়। এই কুকুরগুলো খুবই সামাজিক এবং সতর্ক। এরা হচ্ছে প্যাক প্রাণী তাই এদের যদি বাচ্চা অবস্থা থেকেই লোকজনের সাথে সামাজিকীকরণ ঘটানো যায় তবে এরা খুব ভালোভাবে তা আয়ত্ত করতে পারে। এরা খুব বুদ্ধিমান তাই এদের অকুপাইড এবং চ্যালেঞ্জ করে রাখা উত্তম। এগুলো এদের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির কারণে এরা খুবই স্বাস্থ্যবান তাই এদের স্বাস্থ্য সমস্যা কম। এগুলো মাঝারি সাইজের কুকুর (প্রায় গড়ে ২০ কেজি)। তাই এদের পরিচালনা করা খুব কঠিন না।

স্পিটজ

সামান্য ব্যক্তি নির্ভরতা ছাড়া স্পিটজ হচ্ছে অনেকাংশে পোমেরানিয়ানের মতোই। এই কুকুরেরও খুব ভালো ব্যক্তিত্ব আছে এবং একজনের সঙ্গে লেগে থাকতে ভালোবাসে। এগুলোকে একটি ছোট বাড়িতে রাখা খুব সহজ এবং বেশি ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। যদিও এদের বিশ্রামের জন্যে কিছু সাহায্য প্রয়োজন। তাদের বেশি খাবারের প্রয়োজন নেই তাই ব্যয়বহুলও নয়। এই ছোট কুকুরগুলো সামাজিক তাই তাদেরকে আলাদা করে সামাজিকীকরণের খুব বেশি দরকার নাই। স্পিটজ হল খুব সুন্দর ছোট কুকুর যা পোষা খুব সহজ এবং সবাইকে আনন্দ দেয়।

ল্যাব্রাডর

ল্যাব্রাডর হল একটি বড় জাতের কুকুর যা জলের খেলা এবং শিকারের জন্যে উপযুক্ত। তারা বাইরে যেতে ভালোবাসে এবং এরা অনেক শরীরের কসরত করে। তাই এটি কর্মঠ মানুষ বা পরিবারের জন্য উপযোগী। এরা বাইরে থাকতে ভালোবাসে। তাই থাকার জন্যে বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। কারণ তারা অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকে। এদেরও বুদ্ধি খুব বেশি। বল বা অন্য খেলনা দিয়ে এদের সহজেই মাতিয়ে রাখা যায়। দৌড়ঝাপ করতে পারলে এরা খুব খুশি হয়। এরাও খুব ভালো বন্ধু হয়। এরা খুব অভিযোজনশীল এবং সহজপোষ্য প্রাণী। এরা বড় জাতের তাই এরা দীর্ঘায়ু হয় না। তবে এদের জন্যে একটু বেশি খাবারের প্রয়োজন হয়। এদের শরীরের উষ্ণতা খুব বেশি হয়। তাই এদের শরীরে জলের প্রয়োজন বেশি হয়।

স্যামোয়েড

স্যামোয়েড যেমন ক্ষিপ্র তেমনি সতর্ক। এদের শরীরের উপরিভাগ যেন একটা কোট যা সব ধরনের আবহাওয়ার সঙ্গে এদের মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। এদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ। গায়ে শক্তি খুব বেশি তাই ভারী জিনিসও টানতে পারে। এরা রাস্তায় অথবা বরফের ভেতরেও দক্ষতায় কাজ করতে পারে। হাইকিং করতেও এদের জুড়ি নেই স্যামোয়েডের। এদের গায়ের রং সাধারণত সাদা আর হালকা বাদামি রঙের। স্যামোয়েডের কুচকুচে কালো ঠোঁট দুটো যে কারও মন কেড়ে নেবে এক দেখাতেই।

লোউচেন

জার্মান ভাষায় লোউচেনের অর্থ ছোট্ট সিংহ। ঘাড়ে কেশর নিয়ে জন্মানো দারুণ লেজের মালিক এই লোউচেনেরা সত্যিই ছোট্ট একটা সিংহের মতন দেখতে। কেবল ঘাড়েই নয়। এদের গোড়ালিতেও রয়েছে ঘন লোম। এদের দাম অনেকের থেকেই বেশি।

রোটোয়েলার

পুলিশ, রাখাল ও অন্যান্য কাজে, যেখানে পাহাড়াদারি বা নজরদারির দরকার আছে তাতে নিয়মিত সাহায্য করে যাওয়া কুকুর রোটোয়েলারের যেমন আছে শক্তি, তেমনি আছে বুদ্ধি। এতসব কাজের পাশাপাশি বন্ধু আর সঙ্গী হিসাবেও কিন্তু জুড়ি নেই ওদের।

টিবেটান ম্যাসটিফ

কোট পরা ভদ্রস্থ কুকুর ম্যাসটিফের আদব-কায়দা জ্ঞান খুব বেশি। সচরাচর ঝামেলার ভেতরে যেতে চায় না আর খুব প্রভুভক্ত হয় ওরা।

আকিতা

জাপানে জন্ম হলেও এখন পৃথিবীর সব জায়গাতেই দাপটের সঙ্গে নানা রকম শো করে চলেছে আকিতারা। করছে আরও অনেক রকম কাজও। কোট পরা ঝকমারি লেজের মালিক এই আকিতারা সাহসী আর শক্তিশালী। আকিতা জাতের কুকুরের বিশ্বস্ততা নিয়ে আছে নানান গল্প ও সত্যি ঘটনা। হাচিকো নামের একটি আকিতা জাতের কুকুরের প্রভুভক্তির গল্প খুবই জনপ্রিয়। তাকে নিয়ে ২০০৯ সালে হাচি: এ ডগস টেল' নামে একটি সিনেমাও তৈরি হয়।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ জুন ২০১৭

ক্যুইজ

১) উদ্ভিদ দেহের অতিরিক্ত জল কোন পদ্ধতিতে বেরিয়ে যায়?
২) মাকড়সার শ্বাসযন্ত্রের নাম কী?
৩) ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ ডিওডেনামের কাজ কী?
৪) বাতাসে শব্দের গতিবেগ কত?
৫) আয়নায় গঠিত প্রতিবিম্ব কী?

৬) তিতুমিরের আসল নাম কী ছিল?
৭) গ্রিনিচের দ্রাঘিমা কত?
৮) বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?
৯) কোন দেশকে Lands of Cakes বলা হয়?
১০) বৃহত্তর ভারত নামে পরিচিত কোনটি?
১১) বস্তুর ভর ও আপেক্ষিক তাপের গুণফলকে কী বলে?
১২) হিরে বিশেষভাবে কাটলে হিরের উজ্জ্বলতা বাড়ার কারণ কি?
১৩) বাদুড় ওড়ার সময় যে শব্দ করে, তার নাম কী?
১৪) কাণ্ড,পাতা ও মূলবিহীন গাছকে কী বলে?
১৫) নামধাপা ব্যাঘ্রপ্রকল্প কোন রাজ্যে অবস্থিত?
১৬) পা-বিহীন একটি উভচর কী?
১৭) মাখন তৈরিতে কোন অনুজীব সাহায্য করে?
১৮) ক্ষুদ্রতম ভাইরাসের নাম কী?
১৯) কোন আলোতে বেশি সালোকসংশ্লেষ ঘটে?
২০) কোন উৎসেচক শিশুদেহে দুগ্ধ প্রোটিন পরিপাক করে?
২১) মস্তিষ্কের কোন প্রকোষ্ঠে পিটুইটারি অবস্থান করে?
২২) লাইকেন কোন দূষণের সূচক?
২৩) সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোটিন যুক্ত শৈবাল কোনটি?
২৪) রিখটার স্কেলে কোন ধরনের স্কেল ব্যবহার করা হয়?
২৫) ভারতমাতা চিত্রটি কার আঁকা?
২৬) ঊর্ধ্বভঙ্গ কাকে বলে?
২৭) সাপ সম্পর্কে পড়াশোনাকে কী বলে?
২৮) ভারতের প্রথম জিন প্রযুক্তিজাত উদ্ভিদ কোনটি?
২৯) কোন পর্যায়ের সবগুলি মৌলই তেজস্ক্রিয়?
৩০) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বাইরের আবরণের নাম কী?
৩১) কোন হরমোনকে ক্যালোরিজেনিক হরমোন বলে?
৩২) আধখানা চাঁদের মতো বালিয়াড়িকে কী বলে?
৩৩) কোন নদী গ্রস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত?
৩৪) করপাস ক্যালোসাম মস্তিষ্কের কোন অংশে থাকে?
৩৫)আদি জীব থেকে জীবের ক্রমবিকাশকে কী বলে?
৩৬) ডারউইনের মতে প্রকৃতিতে জীবের সংখ্যা কী হারে বাড়ে?
৩৭) বিবর্তনের ফলে কার্যহীন অঙ্গকে কী বলে?
৩৮) মরুভূমি অঞ্চলে শুষ্ক নদীখাতকে কী বলে?
৩৯) শিলাময় মরুভূমিকে কী বলে?
৪০) একটি জীবন্ত জীবাশ্ম উদ্ভিদের নাম কী?

উত্তর: ১) বাষ্পমোচন। ২) বুকলা। ৩) প্যানক্রিয়াটিক তরলের সাহায্যে খাদ্য পরিপাক করা। ৪) প্রতি সেকেন্ডে ৩০০ মিটার। ৫) অসদবিম্ব। ৬) মীর নিসার আলি। ৭) শূন্য ডিগ্রি। ৮) হাইগ্রোমিটার। ৯) স্কটল্যান্ডকে। ১০) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। ১১) তাপগ্রহীতা। ১২) উচ্চ প্রতিসরাঙ্ক। ১৩) আলট্রা সোনিক। ১৪) থ্যালোফাইট। ১৫) অরুণাচল প্রদেশ। ১৬) ইকথিওফিস। ১৭) লিউকোনস্টক সিট্রোভোরাম। ১৮) রাইনো ভাইরাস। ১৯) লাল আলোতে। ২০) রেনিন। ২১) সেল্লা টারসিকা। ২২) বায়ুদূষণ। ২৩) স্পিরুলিনা। ২৪) লগারিদম স্কেল। ২৫) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৬) ভাঁজের উত্থিত অংশকে ঊর্ধ্বভঙ্গ বলে। ২৭) সার্পেন্টোলজি। ২৮) বিটি কটন। ২৯) সপ্তম পর্যায়ের। ৩০) মেনিনজেস। ৩১) থাইরক্সিনকে। ৩২) বারখান। ৩৩) নর্মদা। ৩৪) মধ্য মস্তিষ্কে। ৩৫) অভিব্যক্তি। ৩৬) জ্যামিতিক হারে। ৩৭) লুপ্তপ্রায় বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। ৩৮) ওয়াদি। ৩৯) হামাদা। ৪০) গিংকগো বাইলোবা।

এডু কাউন্সিলর অ্যাডভাইস

বাবারাই বাচ্চার রোলমডেল

যে কোনও শিশুর জীবনে বাবা-মা দু'জনের উপস্থিতি ভীষণভাবে জরুরি। সন্তান কিন্তু সবসময় বাবা এবং মা দু'জনেরই সান্নিধ্য পেতে চায়। এখানে মা আর সন্তানের সম্পর্কটা সহজাত, বাবা আর সন্তানের কিন্তু ততটা নয়। তাই বাবাকে একটু বেশি এফোর্ট দেওয়া উচিত। ব্যস্ত রুটিনে বেশিরভাগ বাবারাই সন্তানদের সময় দিতে পারে না। ফলে অনেক সময় সম্পর্কে মান-অভিমানের পালা চলে। বাবা এবং সন্তানের সম্পর্ক বেশ ভালো থাকা বাঞ্ছনীয়। কথায় কথায় বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকলে নিজের যাবতীয় সমস্যার কথা সন্তান অনায়াসে বলে ফেলবে নিজের বাবাকে। বাচ্চাদের কথা বলতে পারাটা খুব জরুরি। মনের কথা মনে চেপে রাখা উচিত নয়। ফলে সুসম্পর্ক রাখতে পারলে সন্তান নিজে থেকে মনের সমস্ত গল্প আপনার সঙ্গে ভাগ করে নেবে। তাছাড়া বাচ্চার সঙ্গে সময় কাটালে তার মানসিক বিকাশ ঘটে। বাবা সবসময় সবকাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেন। এটাই কিন্তু সন্তানের জন্য খুব জরুরি। সন্তানের বড় হওয়ার ক্ষেত্রে বাবার ভুমিকাটা যেন শুধু অর্থনৈতিক বা শাসন করার মধ্যে

সীমাবদ্ধ না থাকে। সন্তানের কাছে পৌঁছনোর সেরা মাধ্যম হল তার কাছাকাছি থাকা,খাওয়ানো, হোমওয়ার্ক করতে সাহায্য করা, স্কুলের জন্য তৈরি করা, এইসব ছোট ছোট কাজে তাকে সাহায্য করা। ড্রইং, স্ক্র্যাপবুক বানানোর মতো কাজগুলো একসঙ্গে করতে পারেন।

ছোটবেলায় সাইকেল চালানোর সময় বাবা উদ্যম দেন প্যাডেল করার। সন্তান জানে সে পড়ে গেলে বাবা তো আছেন। বড় হওয়ার পরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই উদ্যম জোগানো জরুরি। সন্তানরা যদি জানে যে বাবাকে পাশে পাবে তাহলে সে এগোনোর সাহস করবে। বাবারা সবসময় চেষ্টা করেন নিজের সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর। সেই চেষ্টায় খামতি হতে দেবেন না। খেলনা ভেঙে গেলে নতুন খেলনা দিন। অন্যদিকে পরীক্ষায় একটু খারাপ হলে সামান্য বকুনি দেওয়াও আবশ্যক কিন্তু পরের বার ভালো করার উৎসাহ দেওয়াও জরুরি।

বাবা-মায়েদের উচিত সন্তানের সামনে ভালো ব্যবহার করা। সম্পর্ক ঠিক রাখা দরকার। কারণ সন্তানের সামনে আপনারা নতুন পরিচয় অর্জন করেছেন। আজ আপনারা মা-বাবা। আপনাদের সম্পর্কের রেশ সন্তানের মধ্যেও পড়বে। বাবা-মায়ের মধ্যে সবসময় ঝগড়া দেখলে বাচ্চার মধ্যে একটা মানসিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। ফলত সে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভয় পেতে শুরু করবে। অপরদিকে যেসব বাবা-মায়ের সম্পর্ক ভালো তাদের সম্পর্ক বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব থাকবে। ফলে সুসম্পর্ক বজায় রাখা জরুরি। মায়ের দায়িত্ব সন্তান বড় হলে তাকে দায়িত্বশীল করে তোলা। কিন্তু বাবারও দায়িত্ব রয়েছে। সারাদিন শাসনে থাকার পর সে যখন একঘেয়েমির শিকার তখন তাকে নতুন নতুন জিনিস শেখান। যেমন ধরুন ড্রাইভিং শেখালেন। কিংবা সাঁতার শেখালেন। সবসময় চেষ্টা করুন সন্তানকে নতুনত্ব দিয়ে চমকে দিতে। এই নতুনত্ব ওর বাঁধা ছকের জীবনের খোলা জানলা। যেখান দিয়ে আলো আসবে কি না নির্ণয় করেন একমাত্র বাবা ।

কাজে ব্যস্ত থাকলেও কখনও সন্তানের উপস্থিতি বা চাহিদাকে এড়িয়ে যাবেন না। ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন হবি এবং ইন্টারেস্টে উৎসাহ দেখান। শুধু বাচ্চার ভালোর জন্য নয়, এতে আপনারও লাভ। বাচ্চাকে সঙ্গ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলেবেলাতেও ফিরে যেতে পারবেন।

বাচ্চার জীবনে শাসনও জরুরি। সঠিক সময় রাশ না টানলে সন্তানের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সে বিপদে পড়তেই পারে। তাই সঠিক সময়ে তাকে শাসন করুন। তবে সেটা করার জন্য তার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতেই হবে। নয়ত সে আপনার কথা শুনবে কেন। সম্পর্ক খারাপ হলে আপনি যেটা বারণ করবেন সে সেটাই বেশি করে করবে। তাই সম্পর্ক ভালো রাখুন এবং সঠিক সময় সন্তানকে বিপদের কথা জানান। আপনার ছোট ছোট সাহায্য ওদের আনন্দ দেবে। ওরা বুঝতে পারবে ওদের সঙ্গে ওদের বাবা সবসময় আছে, যে কোনও সমস্যায় ওরা আপনাকে পাশে পাবেই। ওরা নিজেদের জীবনে বাবার গুরুত্ব বুঝবে এবং আপনাকে ভালোবাসতে ও সম্মান করতে শিখবে।

জেনে রাখতে পারো

অবাক পৃথিবী

পৃথিবীতে কত কিছু ঘটেছে আর ঘটছে। সবকিছুই সত্যি, কিন্তু যেহেতু সবকিছু আমরা দেখতে পাই না বা টের পাই না তাই সেসব শুনলে আমরা অবাক হই। ইতিহাসেও এমন কত তথ্য লুকিয়ে রয়েছে যা আমাদের অবাক করতে পারে। আমরা এসবের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ করি। এসব তথ্য আমাদের চমকে দেয়। কিন্তু ইতিহাস, পরিসংখ্যান, বিজ্ঞান এসব আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আজ আমরা এরকমই কিছু তথ্য জানব।

- মৃত্যুর পরেও মানুষের মস্তিষ্ক আরও প্রায় সাত মিনিট সক্রিয় থাকে এবং এই সময় জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলি সে স্বপ্নের আকারে দেখাতে থাকে।
- ২০১৩ সালে নিউজিল্যান্ড সরকার আটটি জেলখানা বন্ধ করে দিয়েছে অপরাধীর অভাবে।
- মৃত্যুকালে মানুষের প্রথমে দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, এরপর যায় স্পর্শ অনুভূতি এবং সবশেষে যায় শ্রবণ শক্তি।
- চাঁদ প্রতি বছর পৃথিবী থেকে প্রায় দু'ইঞ্চি করে দুরে সরে যাচ্ছে।
- কোনও ভিড়ের মধ্যে আমরা একসঙ্গে শুধুমাত্র দু'টি মুখের উপর দৃষ্টিপাত করতে পারি।
- আজ থেকে একশো বছর পরে ফেসবুকে প্রায় ৯১ কোটি ৬০ লক্ষ মৃত ব্যক্তির প্রোফাইল থাকবে।
- ১৯৭০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেক।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে প্রতি বছর পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু তিন মাস করে বাড়ছে।
- পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষের রক্তের গ্রুপ O+ এবং সবচেয়ে কম মানুষের রক্তের গ্রুপ AB-
- প্রথমদিকে সর্দির ওষুধ হিসাবে হেরোইনের মতো বিষাক্ত ব্যবহৃত হতো।
- ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানব সভ্যতা ক্যামেরায় যত ছবি তুলেছে, আমরা এখন বিশ্বজুড়ে প্রতি দু'মিনিটে তারচেয়ে বেশি ছবি তুলছি।
- আমাদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতি দিন অন্তত একটি কোষ ধ্বংস করে যা আমাদের দেহে ক্যানসার ঘটাতে পারে।
- ডাক্তারদের খারাপ হাতের লেখার কারণে পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় সাত হাজার রোগীর মৃত্যু হয়।
- মোবাইল ফোন চার্জ করার সময় Airplane mode বা Flight mode সেটিং করে দিলে তিনগুণ কম সময়ে চার্জ হবে।
- আয়নায় দেখার সময় আমরা নিজেকে প্রায় ছ'গুণ বেশি সুন্দর দেখি।
- মানুষ সত্যি কথা বলার সময় হাত নাড়িয়ে কথা বলে। মিথ্যা বলার সময় হাতগুলি লক্ষণীয়ভাবে স্থির থাকে।
- কোনও নতুন অভ্যাস তৈরি হতে মানুষের সময় লাগে মাত্র একুশ দিন।
- মেয়েরা অন্য মানুষের মুখ মনে রাখতে বেশি পারদর্শী বিশেষ করে অন্য মেয়েদের মুখ।
- মঙ্গলগ্রহকে লাল দেখায় কারণ এর মাটি লোহার অক্সাইড (Fe2O3) দিয়ে তৈরি। যা আসলে মরচে ছাড়া কিছু নয়।
- পরপর মোট ৪৮০টি কলা খেলে সে ব্যক্তি পটাশিয়ামের ওভার ডোজের কারণে মারা যাবে।

- ফোনে কথা বলার সময় মানুষ স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় তিনগুণ জোরে কথা বলে।
- স্ট্যাচু অব লিবার্টির জুতোর সাইজ ৯৪১, হাতের মধ্যমা আঙুলের দৈর্ঘ্য আট ফুট।
- প্রতি সেকেন্ডে আমাদের চোখ প্রায় ৪০টি স্থির চিত্র মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।
- মহাকাশচারী হতে হলে প্রয়োজন ৫ ফুট ২ ইঞ্চির বেশি এবং ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির কম উচ্চতা।

এরপর আগামী সপ্তাহে

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ জুন ২০১৭

জেনারেল নলেজ

বিলুপ্ত প্রাণী

আমাদের এই পৃথিবীর সবকিছুই এক না একদিন ধ্বংস হয়ে যায়। কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়। প্রকৃতির নিয়মে সবকিছুরই সৃষ্টি আছে আবার শেষও আছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষও দায়ী হয়ে পড়ে ধ্বংসের জন্য। সেইরকম কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা আজ লুপ্ত। হয়তো এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এক প্রজাতির পর আরেক প্রজাতির আগমন ও সমাপন। এরকমই কিছু প্রাণী নিয়েই আজ হোক আলোচনা।

টায়রানোসরাস রেক্স [Tyrannosaurus rex]

টায়রানোসরাস রেক্স নামক প্রাণীটি স্থলে বসবাসকারী মাংসাশি প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে বড় যাদের উচ্চতা ও আকার অন্যান্য যে কোনও প্রাণীকে হার মানায়। এরা সর্বোচ্চ ৪৩.৩ ফিট পর্যন্ত লম্বা এবং ১৬.৬ ফিট পর্যন্ত উঁচু হতো। এদের ওজন হত প্রায় ৭ টন মতো। উত্তর আমেরিকার এক জঙ্গলে এই প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এই প্রাণীটাকে টার্শিয়ারি যুগের সর্বশেষ ডায়নোসর বলে মনে করা হতো। ত্রিশ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ এই টায়রানোসরাস রেক্স প্রাণীটিকে নিয়ে গবেষণা করে তবে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। জীবাশ্মের ফলে পদার্থের জীবন ইতিহাস এবং বায়ো-মেকানিকসসহ জীববিদ্যার অন্য অনেক বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। এরকম ধারণা করেছেন বিশেষজ্ঞরা যে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে এই প্রাণীটি পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস হয়ে যায়।

কুয়াগ্গা [Quagga]

কুয়াগ্গা নামক প্রাণীর দেখা মিলত আমেরিকা মহাদেশে। এটি একটি বিচিত্র বিলুপ্ত প্রাণী। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে প্রাণীটির রূপ কল্পনা করলে মনে হবে অবাস্তব। কিন্তু এটিও কোনও একসময় বাঘ বা হাতির মতো সব সময়ে দেখা যেত। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশে এক রাজ্যের দক্ষিণ খণ্ডে এই প্রাণীটিকে একবার খুঁজে পাওয়া গেছিল যা ছিল এক বিরল ঘটনা। এই প্রাণীটা দেখতে বড়ই অদ্ভুত, এর প্রথম অর্ধেক অংশ জেব্রার মতন দেখতে আর পিছনের অর্ধেক অংশ ঘোড়ার মতো। বিশেষজ্ঞদের গবেষণা বলে ১৮৮৩ সালের পর থেকে এরা বিলুপ্ত হয়েছে। ১৭৮৮ সালে যে সকল প্রাণীর উপস্থিতি ছিল একে সেই প্রজাতিরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৮৭০ সালের দিকে একটি কুয়াগ্গা পাওয়া যায় যেটিকে Artis Magistra Zooতে সংরক্ষণে রাখা হয়। কিন্তু সর্বশেষ পাওয়া এই প্রজাতির প্রাণীটি ১৮৮৩ সালের ১২ আগস্ট মারা যায়। তবে সম্প্রতি স্মিথসোনিয়ান সংস্থা ঘোষণা করেছে এই প্রাণীটি আলাদা কোনও প্রজাতি ছিল না বরং সাধারণ জেব্রাদের মতই ছিল।

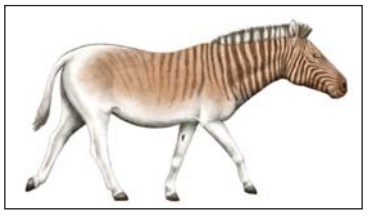

থায়লাসিন [Thylacine]

আধুনিককালে আমরা সকলেই হয়তো এই নামটি শুনেছি। এটি পরিচিত একটি মাংসাশি প্রাণী হিসাবে। বিংশ শতাব্দীর দিকে অস্ট্রেলিয়া এবং নতুন গিনিতে এই প্রাণী কিছু পরিমাণে দেখা যেত। তবে এদেরকে অনেকে তাসমানিয়ান নেকড়ে নামেও চেনে। থায়লেসিন মহাদেশের ইউরোপীয় উপনিবেশের পূর্বে প্রথমে অস্ট্রেলিয়ায় এগুলিকে দেখা যেত। পরে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে এগুলিকে দেখা যেত। ধারণা করা হয় ১৯৩৬ সাল থেকে এই প্রজাতির প্রাণীটি বিলুপ্ত হতে শুরু করে।

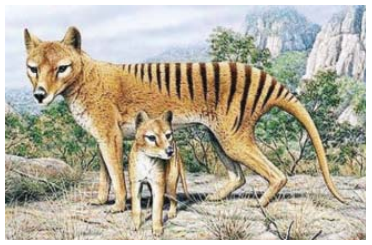

স্টেলার্স সি কাও [Stellers sea cow]

এশিয়াটিক সমুদ্রের উপকূলের কাছে প্রথম অরমারলি প্রজাতির এই প্রাণীটিকে প্রথম খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ন্যাচট্রেলিস্ট জর্জ স্টেলার-এর উদ্যোগে ১৭৪১ সালে এই প্রাণীটিকে খুঁজে বার করা হয়। এই প্রাণীটি প্রায় ৭.৯ মিটার অর্থাৎ ২৫.৯ ফুট লম্বা ছিল। যার ওজন manatee অথবা du gong এর চেয়ে তিন টন বেশি ছিল। স্টেলারের মতো অনুসারে 'এই প্রাণীটি তীরে কখনও আসত না, জলের মধ্যেই সব সময়ে বসবাস করত।' এর ত্বক কালো রঙের এবং এটি অনেক পুরু, অনেকটা পুরনো ওক গাছের বাকলের মত। তবে সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই প্রাণীটির কোনও দাঁত ছিল না। গ্রিনল্যান্ডের সমুদ্রে স্টেলার্স সি কাও-এর মতো এখনও কিছু প্রাণী আছে। বিশেষজ্ঞরা এই প্রাণীদের দেখে এরকম আন্দাজ করছেন যে বর্তমান সময়ে এই প্রাণীর কিছু অংশ হলেও জীবিত আছে। যদিও গবেষকরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই প্রজাতিকে খুজেঁ বার করার কিন্তু এখনও অবধি সেটা সম্ভব হয়নি। তবে এটাকে ১৭৬৮ সালের পর থেকে বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আইরিশ হরিণ [Irish Deer]

'আইরিশ হরিণ' হরিণ প্রজাতির মধ্যে সবথেকে বড় আকৃতির হরিণ ছিল।

আয়ারল্যান্ডে এটা সবথেকে বেশি দেখা যেত। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বর্তমানে আমাদের দেশে গোরু-ছাগলের মতো একসময়ে আয়ারল্যান্ডে এই প্রজাতির হরিণ দেখা যেত। এটি ৫,৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা ৭,৭০০ বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে। এই হরিণের ওজন ছিল প্রায় ৯০ পাউন্ড এবং এটি লম্বায় প্রায় ১২ ফুট ছিল।

ক্যাসপিয়ান টাইগার [Caspian Tiger]

ক্যাসপিয়ান টাইগার ছিল এক দুর্লভ প্রজাতির বাঘ। মাত্র কয়েকটি দেশেই এর দেখা

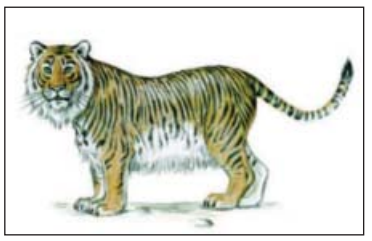

মিলত, সেগুলি হল ইরাক, আফগানিস্তান, তুরস্ক, মঙ্গোলিয়া, কাজাখস্তান, তাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আজ এই প্রজাতিটি বিলুপ্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে ১৯৭০ সালের দিকে এই প্রজাতির বাঘটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই প্রজাতির বাঘের বিশেষত্ব ছিল যে এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম প্রজাতির বাঘ। এই প্রজাতির পুরুষ বাঘের ওজন ১৬৯-২৪০ কেজি পর্যন্ত হত এবং মহিলা বাঘের ওজন ছিল ৮৫-১৩৫ কেজি। তবে এখনও কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন এখনও এই প্রজাতির বাঘের অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও এর সপক্ষে কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

আউর্চস [Aurochs]

ইউরোপের ইতিহাসে কোনও এক সময় এই প্রাণীটি একটি বিখ্যাত প্রাণী ছিল। ইউরোপ

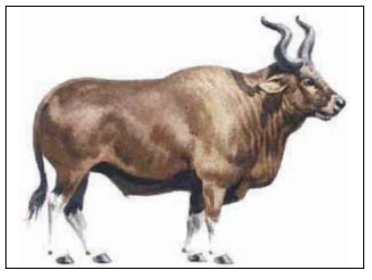

ছাড়াও ভারত এবং এশিয়ার কিছু কিছু দেশে এই প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যেত। ১৫৬৪ সালে গেমকিপারস পরিসংখ্যান অনুসারে কেবল ৩৮টি এই প্রাণীর সংখ্যা বার করতে পেরেছিলেন। তবে ১৬২৭ সাল থেকে এই প্রাণীটিকে বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন।

গ্রেট অক [Great Auk]

গ্রেট অক প্রজাতির প্রাণীটি আসলে ছিল পেঙ্গুইনেরই একটি প্রজাতি। এই প্রাণীটিকে আটলান্টিক সমুদ্রের ব-দ্বীপ ও দেশগুলোতে দেখা যেত। দাঁড়ানো অবস্থায় এই প্রাণীটির উচ্চতা ছিল ৭৫ সেন্টিমিটার বা ৩০-৪০ ইঞ্চি মতো। তবে ওজন এদের খুব বেশি ছিল না, খুব বেশি হলে ৫ কেজির মতো হতো। এই প্রাণীটিকে প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত কানাডা,

গ্রিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড এবং গ্রেট ব্রিটেনে। এই প্রাণীটিকে শিকার করার নেশাও সেই সময় মানুষের ছিল। বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেন, ১৮৪৪ সালের পর থেকে এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের লুপ্ত হওয়ার পিছনে কিছুটা হলেও মানব প্রজাতি দায়ী।

কেভ লায়ন [Cave Lion]

সিংহরা গুহায় বাস করে এমনটা আমরা গল্পে শুনেছি ঠিকই কিন্তু একটু খেয়াল করলে আমরা দেখব খুব কম সংখ্যক প্রাণীই আছে যারা গুহায় বাস করে। তবে এটা ঠিক কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা গুহাতেই নিজেদেরকে বেশি নিরাপদ মনে করত। কেভ লায়নও ছিল এই প্রজাতিরই অংশ। এরাও গুহাতেই বসবাস করত। এদের আরেক নাম আছে যা হল ইউরোপিয়ান বা ইউরেসিয়ান গুহা সিংহ। অনুমান করা হয় এই প্রজাতির সিংহ ২০০০ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তবে ১৯৮৫ সালে এই প্রজাতির একটি পুরুষ সিংহ জার্মানির সিয়েগসডর্ফের কাছে পাওয়া যায়। তখন বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল ১০,০০০ বছর আগে এই প্রাণী বিলুপ্ত, কিন্তু এত বছর পর যখন এর হদিশ মেলে তখন অনুমান করা যায় আজও হয়তো এর কিছু অংশ জীবিত আছে।

উত্তরণের

জেনারেল নলেজ

তোমাদের কেমন লাগছে, মেইল করে জানাও আমাদের।